আমার শ্বশুরমহাশয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বয়স যখন ষোলো সেইসময় আমার শাশুড়িঠাকরুন শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কনিষ্ঠা বোন শ্যামা ও ভ্রাতৃবধূ প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগরে আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন পুত্রবধূরূপে নির্বাচন করার জন্য। আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্রী।

খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার ভীষণ বই পড়ার নেশা ছিল। বাপের বাড়ি কৃষ্ণনগরে হলেও আমার শিশু বয়স থেকে কিশোরবেলা কাটে নৈহাটি মামার বাড়িতে। একটি ব্লকে অনেক বাড়ির মধ্যে আমাদের বাড়িটিই ছিল বাগান দিয়ে ঘেরা। আমার দাদু নিজে হাতে বাগানের যত্ন করতেন। আমি ভোরবেলা উঠে গাছের নীচে ভর্তি হয়ে থাকা শিউলি ফুল ও লঙ্কাজবা (যা এখন বেশি দেখা যায় না) মুঠো মুঠো করে ফুলের ঝুড়িতে কুড়িয়ে রাখতাম মালা গাঁথার জন্য। গানের মাস্টারমশাই আসতেন গান শেখাতে। তারপর স্কুলে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে বই দেওয়া-নেওয়া করে পড়া ইত্যাদি চলত। আমাদের বাড়িতে আসত *বসুমতী*, *ভারতবর্ষ* ইত্যাদি পত্রিকা। পাশের বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁরা রাখতেন *সন্দেশ* পত্রিকা। সব বাড়িতে আমার ছিল অবারিত দ্বার। ওঁদের বাড়ি গিয়ে *সন্দেশ* পত্রিকা পড়া, অন্য আর এক বাড়িতে গিয়ে নিজেই গ্রামাফোন চালিয়ে গান শোনা, আর এক বাড়িতে যেখানে প্রায় ষাট-সত্তর বছর বয়সের মানুষ শ্রী সুভাষ রায়চৌধুরী — যাঁকে আমি ডাকতাম 'বন্ধু' এবং উনি আমার নাম দিয়েছিলেন 'মধুমতী'। অসাধারণ সব গল্প বলতেন, যেমন শেক্সপীয়ারের নাটক *হ্যামলেট*, *ম্যাকবেথ*, *ওথেলো*, *মার্চেন্ট অফ ভেনিস*, *কমেডি অফ এররস্* ইত্যাদি। তাঁর থেকে আমি অনেক ঋদ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর স্ত্রী এখনও জীবিতা এবং আমি এখনও তাঁর কাছে 'মধু'। ছেলেবেলা থেকেই আমার অসম্ভব প্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। কবিদের মধ্যে মধুসূদন, বিহারীলাল, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ বাগচী এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

আমার শাশুড়িমাতা আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন কোন বই আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমি বলেছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ*-ই আমার সবথেকে প্রিয় বই। তখন আমি জানতাম না যে, আমার শ্বশুরমশাইয়েরও সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল *রাজসিংহ*।

এর পরের ঘটনার বিস্তৃতিতে যাচ্ছি না কারণ যেটা বলার কথা, তাই হয়তো শেষকালে উহ্য থেকে যাবে।

উনিশশো বাহাত্তর সালে ষোলোই জুলাই, বিয়ের পরদিন আমার শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ। আমি তখন একাদশ শ্রেণিতে পড়ি এবং আমার স্বামী তারাদাস পড়েন এম এ ক্লাসে। তাঁর তখন বয়স চব্বিশ। আমার শাশুড়িঠাকরুন আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও সঙ্গে আমার মামাশ্বশুর ও মাসিশাশুড়িরা আমাকে সকলেই খুব ভালোবাসতেন। এখানে এসে দেখলাম সকলেই সাহিত্য ও সংগীত ভালোবাসেন। প্রায়ই সাহিত্যসভা বসে এবং কবি ও লেখকেরা তাঁদের লেখা পাঠ করেন। পড়া হয়ে গেলে সেইসব লেখার সুন্দর সমালোচনা হয়, তাতে কবি-সাহিত্যিকদের আরও আগ্রহ

বাড়ে নিজেদের লেখাকে আরও উন্নত করার জন্য। মাঝে মাঝেই গানের আসর বসতো এবং আমিও তাতে যোগ দিতাম। এখানে আসার পরে আমার জন্য গানের শিক্ষকও ঠিক হল। আমার শাশুড়িঠাকরুন সন্ধ্যাবেলা আমাকে কাছে বসিয়ে মাথায় তেল মাখিয়ে চুল বেঁধে দিতে দিতে পুরোনো দিনের গল্প, আমার শ্বশুরমশাইয়ের গল্প, দেশের বাড়ির গল্প শোনাতেন। উনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিভিন্ন গাছপালা ও তাদের বোটানিকাল নাম শিখেছিলেন এবং আমাকেও অনেক শিখিয়েছিলেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে মাত্র দশবছর ঘর করতে পেরেছিলেন। সাতাশ বছরের স্ত্রী কল্যাণী ও তিনবছরের শিশুপুত্র বাবলুকে (তারাদাস) নিঃসন্তান ভাই নুটুবিহারী ও তাঁর স্ত্রীকে রেখে মাত্রই ছাপ্পান্ন বছর বয়সে ১৯৫০ সালে ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ দেহত্যাগ করেন। দিনটি ছিল পনেরোই কার্তিক, পয়লা নভেম্বর উনিশশো পঞ্চাশ সাল। শ্বশুরমশাইয়ের বয়স তখন মাত্রই ছাপ্পান্ন। সংসারে নেমে এল দুঃসময়। দাদার অসুস্থতার সময় তাঁর ভাই মিলিটারি ডাক্তার নুটুবিহারী নিজেই চিকিৎসার ভার তুলে নিয়েছিলেন। দাদা ছিলেন নুটুবিহারীর পরমপ্রিয় মানুষ। দাদাকে নিয়ে সর্বত্র অহংকার করে বলে বেড়াতেন। একবারের একটা মজার ঘটনা বলি — ট্রেনে করে নুটুবিহারী কোনো একটি জায়গায় যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে কয়েকজন মানুষ চিনতে পেরে দাদা বিভূতিভূষণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, এবং সকলেই নুটুবাবুর দাদার খুব প্রশংসা করতে লাগলেন, তাঁর লেখার কথা, মানুষ হিসাবে কেমন ইত্যাদি নিয়ে খুব হই হই আর আনন্দ করতে লাগলেন। এইসময়ে একজনের মনে হল — আরে আমরা তো খালি বিভূতিবাবুর কথাই বলে যাচ্ছি কিন্তু তাঁর ভাইয়ের কোনো পরিচয় তো কাউকে বলছি না — সেই ভদ্রলোক তখন নুটুবিহারীর কথা বলে সবাইকে জানালেন আর হ্যাঁ, ইনি বিভূতিবাবুর ভাই, ডাক্তার নুটুবিহারী। তখন দাদাভক্ত ভাইটি বললেন — ক্ষমা করবেন, আমি শুধু বিভূতিভূষণের ভাই হয়েই থাকতে চাই।

আরও একটি ঘটনার কথা বলি। তখন বিভূতিভূষণের শ্বশুরমশাই চাকরি করতেন কোলাঘাটে। বিভূতিবাবুর স্ত্রী রমা দেবী বাপেরবাড়িতে এসে রয়েছেন এবং সঙ্গে তাঁর স্বামীও আছেন। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা শুরু হল। সমস্ত দিক উথাল-পাতাল। বিভূতিভূষণ ওই ঝড়ের মধ্যে ভাই ঘাটশীলায় কীভাবে আছেন দেখতে রওনা হলেন, আর ঘাটশীলা থেকে ভাই নুটু রওনা দিলেন কোলাঘাটে দাদা কী অবস্থায় আছেন দেখার জন্য। মাঝপথে দু-ভাইয়ের দেখা। তখন দুজনের মনই শান্ত হল। দাদা যা বলতেন, সেটাই ছিল ভাই নুটুর কাছে একমাত্র কর্তব্য কাজ।

এই দাদাকে যখন নুটু বাঁচাতে পারলেন না, সেটা ছিল তাঁর কাছে মর্মান্তিক যন্ত্রণা। তার থেকে উনি আর বেরুতে পারলেন না। দাদার মৃত্যুর আটদিনের মাথায় কার্বোলিক অ্যাসিড খেয়ে উনি আত্মহননের পথ বেছে নিলেন। তাতে সংসারটা একেবারেই ছারখার হয়ে গেল। দুই ভাইয়ের দুই বিধবা স্ত্রী, সঙ্গে একটি শিশুপুত্র বাবলু (তারাদাস)। সংসারে নেমে এল দুর্দৈব। দুই বউয়ের বাপের বাড়ি থেকে আত্মীয়স্বজনেরা ঘাটশীলায় চলে গেলেন। ওইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি করে যে যার বাপের বাড়িতে যাবেন। আগের দিন রমাদেবী স্বপ্ন দেখলেন — বিভূতিভূষণ বলছেন, কী সব ছাইপাঁশ দিয়ে বাক্স গুছিয়েছ। সব ফেলে দিয়ে আমার বইপত্র সব সঙ্গে নাও। আমার শাশুড়িঠাকরুন সেই মুহূর্তে উঠে সবকিছু ফেলে দিয়ে তাঁর স্বামীর বইগুলি, লেখার পাণ্ডুলিপি, অজস্র চিঠিপত্র

সব বাক্সে ভরলেন। তাঁদের অত সুখের সংসার ছেড়ে দুই বউই রওনা হলেন তাঁদের যার যার বাপের বাড়িতে।

বিভূতিভূষণ অজস্র চিঠি লিখতেন তাঁর ভাইকে। কলকাতা থেকে একটা চিঠি লিখেছিলেন ১৩.২.১৯৪৮ সালে। সেটি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

কলিকাতা
১৩-২-৪৮

কল্যাণবরেষু,

নুটু, কাল বারাকপুরে মহাত্মাজীর অস্থি বিসর্জন উৎসব দেখলুম। তোমার বৌদিদিও সঙ্গে ছিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। ৫/৬ লক্ষ লোক হয়েছিল। আজ কলিকাতায় এসেছি। এখানে আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন। কাল সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি হয়েচে। সুন্দরমামার সঙ্গে দেখা হয়নি।

গৌরীশংকরের[১] বাড়ি দেখো। আমাদের বাড়ির সামনে যে দুখানা ঘর, তাই দেখো। ১৫ দিন পরে হোলেও ক্ষতি নেই।

খোকা ভাল আছে। খুব হাসলে আমায় দেখে। আর সকলে ভালো আছে। তুমি, বৌমা, উমা[২] ও গুট্‌কে[৩] আমার আশীর্ব্বাদ নিও।

ইতি
শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার শ্বশুরমশাইয়ের দু-তিনটি মজার ঘটনা জানাই। কোনো একবার গজেনকাকু (গজেন্দ্রকুমার মিত্র) প্রস্তাব দিলেন কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে পুরী বেড়াতে যাবেন। সঙ্গে গজেনকাকুর বড়দা অর্থাৎ বিভূতিভূষণ, লেখক সুমথনাথ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং তাঁদের অর্ধাঙ্গিনীরাও (আর কারা ছিলেন মনে পড়ছে না) সকলে রওনা দিয়ে পুরী পৌঁছোলেন। গজেনবাবু প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেতেন। তাঁর মাকে নিয়ে প্রায়ই তীর্থক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন। কাকাবাবুদের বাড়ি ছিল কাশীতে। এইসব কারণেই কাকাবাবুর মোটামুটি সব জায়গাতেই পরিচিতি ছিল। একবার গজেনকাকু হরিদ্বারে গঙ্গায় নেমে স্নান করছেন খালি গায়ে। তাঁকে দেখে আশেপাশে ভিড় জমে গিয়েছিল। এত সুন্দর দেখতে এত ফরসা মানুষটি কে! সকলেই তাঁকে আড়ালে 'শ্বেতহস্তী' বলত। কাকাবাবু কাউকে চিঠি দিলে শেষে লিখতেন — ইতি — 'গ'।

হোটেলে উঠে স্নান সেরে সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন।

---

১. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক, পাবলিশার ও বিভূতিভূষণের ভক্ত)

২. উমা (বিভূতিভূষণের ভাগনী ও বোন জাহ্নবীদেবীর কন্যা। তাঁর স্বামী লেখক প্রয়াত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩. গুট্‌কে (বনগা গোপালনগরের প্রতিবেশী)

তাঁদের পাণ্ডা ছিলেন মধুসূদন সিঙ্গারী (ভিতরছ)। তাঁর কাছেই মূল মন্দিরের চাবি থাকত। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজও আছেন ওই মন্দিরেই। আমার শ্বশুরমশাই গজেনকাকুকে জিজ্ঞাসা করলেন — গজেন, তোমাদের ঠাকুর তো এতো জাগ্রত, তাহলে আমি যা চাইব, তাই কি পাব? কাকাবাবু উত্তর দিলেন — বড়দা, আপনি যদি সত্যি সত্যি অন্তর থেকে চাইতে পারেন, তবে অবশ্যই পাবেন। তখন ছিল ঘোর শীতকাল। আমার শ্বশুরমশাই বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমার ঠাকুরের কাছে ল্যাংড়া আম খেতে চাই। গজেনবাবু বললেন, মন দিয়ে ডেকেছেন তো? এবার দেখা যাক। পুজো সমাপনান্তে সকলে হোটেলে চলে এলেন এবং রাত্রিতে মন্দিরের ভোগ তাঁরা যেখানে আছেন, সেইখানে যাতে পৌঁছোয় তার জন্য জানিয়ে এলেন।

সন্ধ্যা হল। হোটেলের দরজায় ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ। কাকাবাবু বললেন — মনে হয় ভোগ এসে গেছে। যিনি ভোগ নিয়ে এসেছিলেন তিনি গজেনবাবুকে বললেন, আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। এক ভক্ত মানসিক করে গেছিলেন, যদি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তবে তিনি ল্যাংড়া আম ভগবানের জন্য নিয়ে আসবেন। সেই ভদ্রলোক আজ নিউমার্কেট থেকে কিনে ল্যাংড়া আম দিয়ে পুজো দিয়েছেন। তার থেকে আপনাদের জন্যেও ভোগের সঙ্গে আম নিয়ে এসেছি। গজেনবাবু তখন বড়দার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন আর ওদিকে বড়দা বললেন, এটা কিন্তু সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার! সত্যিই এরকম হয়?

বিভূতিভূষণ এই কথা বললেও তিনি ছিলেন অসম্ভব ঈশ্বরবিশ্বাসী; তবে তাঁর সেইরকম বিশ্বাস ছিল না — যেভাবে আমরা ঈশ্বরকে ভাবি। সকালে উঠে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে বাতাসা দিয়ে পুজোর উনি একেবারেই বিরোধী ছিলেন। তাঁর ভাবনার সঙ্গে অনেকটা ব্রহ্মোপাসনার মিল পাই আমি। একবার দেশের বাড়ি থেকে অর্থাৎ গোপালনগর (বনগাঁ রানাঘাটের মাঝখানে) থেকে বনগাঁ যাবেন পায়ে হেঁটে যেতে প্রায় পাঁচমাইল পথ, হঠাৎ কী মনে হল — একই রাস্তায় না গিয়ে একটু গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগলেন, হঠাৎ দেখেন একটা সবুজ শেয়ালকাঁটা গাছে হলুদ ফুল ফুটে আছে এবং সেই ফুলের ওপর একটি সুন্দর প্রজাপতি ঘুরছে। দৃশ্যটি দেখে তিনি ওই জঙ্গলেই মাটিতে বসে পড়লেন এবং ঈশ্বরের উপাসনা করতে লাগলেন। পরে একটি দিনলিপিতে লিখছেন : ঈশ্বর, তোমার এই সৌন্দর্য দেখানোর জন্যই কি তুমি আমাকে ঘুরপথে নিয়ে এলে? তাঁকে অনেকেই দীক্ষা নিতে বলেছিলেন কিন্তু ওঁর উত্তর ছিল — আমি নিজে ঈশ্বরের সন্তান, আমি কেন কারো মাধ্যমে তাঁর কাছে যাব? যেতে হবে আমি সরাসরিই যাব।

যখন ঘাটশীলায় তাঁর মৃত্যু আসন্ন, অনেক মানুষ ও প্রিয়জনে ভরে গেছে তাঁর চারিদিকে। এঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন (ঘাটশীলা)-এর স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। আমার শ্বশুরমশাইয়ের তখন প্রবল শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তার মধ্যেই তিনি মহারাজকে বললেন, আমাকে নাম শোনান। মহারাজও নাম শোনাচ্ছেন। সেইসময় বিভূতিভূষণ বললেন, কই আপনি তো রামপ্রসাদের নাম বললেন না? ওইসময় শ্বশুরমশাই বলে উঠলেন এত আলো কেন? মহারাজ পরে বলেছিলেন, পুণ্যাত্মাদের এইরকমই হয় মৃত্যুকালীন সময়ে।

সেইসময়ে আমার শাশুড়িঠাকরুনের মানসিক অবস্থা পাগলের মতো। উনি শ্বশুরমশাইকে বললেন: তোমার *দেবযান* কি সত্যি? উনি বললেন : হ্যাঁ। আবার কল্যাণী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি যে এত দেশের বাড়ি ভালোবাসতে, ইছামতীতে স্নান করতে ভালোবাসতে, তুমি সেগুলো আর করবে না? উনি উত্তর দিলেন — অতি কষ্ট করে, হ্যাঁ, তোমরা যাবে, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। আবার আমার শাশুড়িমা জিজ্ঞাসা করলেন — আমাকে আর বাবলুকে তুমি কোথায় রেখে যাচ্ছ? উনি বললেন : ঈশ্বরের পায়ে।

এরপর কল্যাণী দেবী তাঁর ক্রন্দনরত শিশু বাবলুকে তাড়াতাড়ি খাট থেকে তুলে নিয়ে এলেন। পুত্রের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বিভূতিভূষণের চোখ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

বিভূতিভূষণের ভাষায় মৃত্যু হল এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া। মাঝে দেওয়াল থাকলে যেমন পাশের ঘরের কিছু দেখা যায় না, মৃত্যুও সেইরকম। তাঁর *দেবযান* বইটি, যার নাম আগে দিয়েছিলেন *দেবতার ব্যথা*। পাঠকদের আমি পড়তে অনুরোধ করি। তাঁর যে কথাগুলি *দেবযান* উপন্যাসে আছে, বৈজ্ঞানিকরা তা এখন স্বীকার করছেন।

সাহিত্যিক বিভূতিবাবুকে বহু বিখ্যাত মানুষ চিঠি দিতেন বিভিন্ন কারণে, তার বেশিরভাগই ছিল নানা পত্রিকা থেকে লেখা জমা দেওয়ার তাগাদা। তার মধ্যে কয়েকটি চিঠি এখানে আমি সন্নিবিষ্ট করব। এবার যে চিঠিটা সম্বন্ধে লিখব, সেটি পাঠিয়ে ছিলেন বিভূতিভূষণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী — যাঁকে আমরা অনেকে 'নিরোদ সি' নামেই জানি। কোনো একসময় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, নীরদবাবু এবং বিভূতিভূষণ একই মেসে মীর্জাপুর স্ট্রিটে একসঙ্গে থাকতেন। নীরদবাবু যদিও অত্যন্ত ইংরেজ মনোভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন কিন্তু হাটেমাঠে ঘুরে বেড়ানো, অত্যন্ত সাধারণ পোশাকের মানুষ বিভূতিকে উনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বিভূতিভূষণের অসাধারণ ইংরেজি জ্ঞান সম্বন্ধে অত্যন্ত সশ্রদ্ধও ছিলেন। তাঁর জন্য নীরদবাবুর দ্বার ছিল অবারিত। তাঁর সাহেবিভাবে বাড়িতে খাটের ওপর ধুলোবালি মাখা পা নিয়ে উঠে বসতে উনি আর কাউকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই *THY HAND, GREAT ANARCH!*-এ শুধু বিভূতিভূষণকে নিয়েই একটি অধ্যায় লিখেছেন নীরদবাবু। তাঁর স্ত্রী অমিয়া দেবী চৌধুরানীও খুব পছন্দ করতেন তাঁর স্বামীর এই আত্মভোলা বন্ধুটিকে। এবার যে চিঠিটি নীচে দিচ্ছি, এইসময় নীরদবাবু থাকতেন দিল্লিতে।

P.E.0. Buildnigs, Nichobai Road,
Delhi, Dec 21, 1946

প্রীতিভাজনেষু, বিভূতিবাবু, আপনার চিঠিখানা পাইয়া খুবই সুখী হইলাম। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখিবেন। দেখাশোনা ত কালেভদ্রে ভিন্ন হইবে না, সুতরাং যোগাযোগ চিঠিতেই রাখিতে হইবে। গেল বার বলিয়া গিয়াছিলেন যে, ডিসেম্বর মাসে আসিবেন, সুতরাং আমরা আপনাদের আসার আশায় ছিলাম। না আসায় নিরাশ হইয়াছিলাম। যদি এদিকে আসেন, সোজা আমার এখানে উঠিতে ইতস্তত করিবেন না।

উদয়পুর চাকুরী পাইয়াছিলেন, ত আসিলেন না কেন? ঘরমুখো বাঙালীত্ব ছাড়ুন। বাংলাদেশে আর আশা কি? আমাদের কিছু থাকিলেও, আমাদের ছেলেপিলেদের জন্য আর কিছু থাকিবে না। দিল্লী আসিয়া বহুদিক হইতেই বাঁচিয়াছি। অবশ্য কতদিন থাকিব বলিতে পারি না। তবে এখান হইতে গেলেও বাংলাদেশে ফিরিবার বিশেষ ইচ্ছা নাই।

ইতিমধ্যে বিলাতের একটি বড় মাসিক পত্রে আমার দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আর একটি এই মাসের শেষে বাহির হইবে। সম্পাদকরা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ও যে টাকা দিয়াছেন, তাহা আমার ল্যাজ ফুলাইবার মত। আমার দিক হইতে বক্তব্য এই যে, ইহার পূর্ব্বে কোনো ভারতবাসী বিলাতের কোন প্রথম শ্রেণীর কাগজে বিলাতী পলিটিকস্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করে নাই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিলে বিলাতী সম্পাদকরা নিতে পারে, কিন্তু বিলাতের রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের মতামত তাহারা অগ্রাহ্যই করিয়া আসিয়াছে। আমার প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শুনিলে আপনি আরও আশ্চর্য্য হইবেন। আমার বিষয় : reinterpretation of conservatism. ভারতবাসী হইয়া যে, বিলাতী কনসারভেটিজ্‌ম্-এর প্রচারক হইব আগে ভাবি নাই, কিন্তু এখন দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি — conservatism-এর মধ্যে যাহা আছে, leftism-এর মধ্যে তাহা নাই। অবশ্য আমার conservatism-এর সংজ্ঞা না জানিলে, আমার এই মত আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকিবে।

আপনি এখন কি লিখিতেছেন জানাইবেন। মাঝেমাঝে কলিকাতা নিশ্চয়ই যান। সাহিত্যিক সমাজের খবর দিবেন। এইবার ছুটি লইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল কলিকাতা যাইব। কিন্তু অবস্থা চক্রে তাহা হইল না। কাল আগ্রা মথুরা ইত্যাদি বেড়াইতে যাইতেছি। এই মাসের শেষদিকে ফিরিয়া আসিব। আপনি ত বহু আগেই দেখিয়া সারিয়াছেন। আমার জীবনে সবই দেরীতে হইল। সাংসারিক সচ্ছলতা, বিবাহ ইত্যাদি সবই।

আমার স্ত্রী সর্ব্বদাই আপনার কথা বলেন। আপনার স্ত্রী এখানে আসিলেন, অথচ দুজনে দেখা হইল না, ইহা তাঁহার অত্যন্ত ক্ষোভের ব্যাপার। ছেলেরা ভাল আছে। আশা করি আপনি ও আপনার পত্নী ভাল আছেন। আপনার সন্তানাদি কিছু হইল? ইতি

আপনার নীরদ

এখন আমি আমার শ্বশুরমশাইয়ের জীবনের একটি মজার ঘটনার কথা লিখছি।

বিভূতিভূষণকে প্রায়ই নানান জায়গায় সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করতে যেতে হত।

একদিন 'মিত্র ও ঘোষ'-এ বসে দুপুরবেলায় অনেক সাহিত্যিকই আড্ডা দিচ্ছেন, এমন সময় সম্ভবত যত দূর মনে পড়ছে উত্তরবঙ্গের কোনো একটি সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য দুটি ছেলে এসে একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছে। এর আগেও তারা ওই সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করে গেছিল। (আমি তাঁর নামটি ইচ্ছে করেই উল্লেখ করছি না।) তিনি ছেলেদুটির সঙ্গে নানারকম বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর নানান বায়না যাওয়া এবং আসার ব্যাপারে, থাকার ব্যাপারে নানারকম চুক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন এবং ছেলেদুটি অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে তাঁকে অনেক উপরোধ অনুরোধ করতে লাগল এবং উনি না গেলে তাদের

যে সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে যাবে তাও বলল, কিন্তু সেই সাহিত্যিক অনড়। ব্যথিত মনে ছেলেদুটি বেরিয়ে গেলে বিভূতিভূষণ পেছন পেছন গেলেন এবং ওদের ডেকে বললেন : 'শোনো একটা কথা বলি, আমি গেলে কি তোমাদের কাজ হবে?' বললেন : 'আমাকে তোমাদের কিছুই দিতে হবে না। দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট দিয়ে নিয়ে গেলেও হবে।' ছেলেদুটি ভেবে পাচ্ছে না এই সাধারণ চেহারার এবং অত্যন্ত সাধারণ জামাকাপড় পরা মানুষটি কে? তাদের একটু সংকোচ হল এবং সেটা বুঝে বিভূতিভূষণ বললেন : 'তোমরা আমাকে চেনো না, তবে হয়তো আমার একটি বই আছে শুনে থাকবে — *পথের পাঁচালী*।' এই কথা শুনে ছেলে দুটি শিহরিত হয়ে বলল : 'আপনি বিভূতিভূষণ?' তারপর প্রণাম করে বলল : 'এ তো আমাদের মহাসৌভাগ্য! উনি না যাওয়াতে আমাদের আরও ভালো হোল।' এর পরের কথা আর বলার দরকার পড়ে কি?

আমার শ্বশুরমশাইয়ের ভীষণ বেড়ানোর নেশা ছিল। বেশিরভাগই পায়ে হেঁটে। এটা বোধহয় পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। তাঁর পিতা মহানন্দ শুনেছি হেঁটে হেঁটে পেশোয়ার পর্যন্ত চলে গেছিলেন। একদিন সকালে ঘাটশিলার বাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে হাঁটতে বেরুলেন এবং যাওয়ার সময় ভাইয়ের স্ত্রী যমুনাকে বলে গেলেন : 'বউমা, চা বসাও, আমরা একটু পরেই ফিরে আসবো।' আমাকে আমার শাশুড়িঠাকরুন বলেছিলেন এই ঘটনাটা। বেড়াতে বেড়াতে বহুদূর পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়ে গেল, আমার শাশুড়িঠাকরুনের তখন অসম্ভব খিদে পেয়েছে। এদিকে তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, স্বামীকে কিছু বলতে লজ্জা করছে। শ্বশুরমশাইয়ের নিজেরও বোধহয় খিদে পেয়েছিল, উনি বললেন : 'তোমার খিদে পেয়েছে তো? চলো, গাছ থেকে আমলকী পেড়ে খাই।' তিন-চারটে করে আমলকী খেয়ে যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন প্রায় সন্ধে। এসেই বললেন : 'বউমা, চা করে রেখেছো তো?'

বিভূতিভূষণের 'দিনলিপি' লেখার খুব অভ্যাস ছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে বোধহয় বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না যাঁর নিয়মিত ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। বিভূতিভূষণের ডায়েরিগুলোর নাম : *অভিযাত্রিক* (১৯৪০), *স্মৃতির রেখা* (১৯৪১), *তৃণাঙ্কুর* (১৯৪৩), *ঊর্মিমুখর* (১৯৪৪), *বনে পাহাড়ে* (১৯৪৫), *উৎকর্ণ* (১৯৪৬), *হে অরণ্য কথা কও* (১৯৪৮), শেষের ডায়েরিটির কোনো নামকরণ করার সুযোগ পাননি যাতে তাঁর মৃত্যুর তিনদিন আগে পর্যন্ত লিখেছিলেন, সালটি ১৯৫০। এই দিনলিপিগুলি তাঁর লেখা উপন্যাস ছোটোগল্পের মতোই সুখপাঠ্য। 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনালয় থেকে এটি একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। নাম *দিনের পরে দিন*।

বিভূতিভূষণ তাঁর লেখার প্রতি এত সনিষ্ঠ ছিলেন তা একটি ঘটনা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন। যতদূর সম্ভব বইটি ছিল *অনুবর্তন*। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি গজেনকাকার হাতে দিয়েছেন প্রকাশের জন্য। এক সপ্তাহ পরে যখন 'মিত্র ও ঘোষ'-এ গেছেন, গজেনবাবু বললেন : 'বড়দা, আপনি যে বইটি দিয়েছেন তাতে তিন-চারটি শব্দ বদলে দিয়েছি, দেখুন তো — ধরতে পারেন কী না।' বইটির কয়েকপাতা উলটিয়ে দেখে বিভূতিবাবু বললেন : 'এই যে এই শব্দগুলি কিন্তু আমার নয়, কারণ আমি এই জায়গাতে কখনোই এইরকম শব্দগুলি ব্যবহার করি না।' গজেনবাবু তাঁর বড়দাকে প্রণাম করলেন এবং বললেন : 'সত্যিই আপনি ধন্য।'

লেখার মধ্যে প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত সচেতনভাবেই প্রয়োগ করতেন বিভূতিভূষণ।

আর-একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন আসানসোল থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়। নিম্নে তা উল্লেখিত হবে।

আমি যখন আমার স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকাশনালয়ে যেতাম — বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা হত। বেশিরভাগই আমার শ্বশুরমশাইয়ের আমলের। তাঁরা প্রত্যেকেই বিভূতিভূষণের পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বেশিরভাগই মিত্র-ঘোষের ঘরে তাঁদের কাছে বসে বহু আলোচনা শুনতে পেতাম। প্রমথনাথ বিশী মহাশয়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিবরাম চক্রবর্তী, ইন্দ্র দুগার প্রমুখেরা আসতেন। ওখানেই পরিচিত হই অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে। প্রায় ছ-ফুট লম্বা, একটু ঢেউ খেলানো কাঁচা-পাকা ও ঈষৎ বড়ো চুল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সুদর্শন ও অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। খুব স্নেহ পেয়েছিলাম তাঁর কাছে। আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল — তা তাঁর চিঠিটি পড়লেই পাঠকেরা জানতে পারবেন।

আসানসোল
২৬.২.৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার খামের চিঠি ও পরে ফের পোস্টকার্ড পেলাম। আপনার চিঠি পড়ে খুব ভাল লাগল ও মন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। আপনার মনের মত নির্মল মন আর কজনের আছে?

গজেনবাবু দয়া করে "দেবযান" পাঠিয়ে দিয়েছেন একখানা। বইখানা পড়ে অনেক জানলাম ও শিখলাম। প্রেততত্ত্বের ঊর্ধ্বে যে অমৃততত্ত্ব রয়েছে মনে এখন তারই জন্যে পিপাসা জেগেছে। কিন্তু জ্ঞানের পথে কি কিছু পাব? অথচ ভক্তি কই? ভক্তির জন্যেও তো তাঁর কৃপা চাই। সেই কৃপা কি তিনি করবেন? তাই — "ত্রাহি মাং মধুসূদন" ছাড়া আর কোনো প্রার্থনা খুঁজে পাচ্ছিনা।

আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমিও অত্যন্ত উৎসুক। মার্চ মাসে — রেলস্ট্রাইক না হলে — আমিও একবার কলকাতা যাব। তখন আশাকরি দেখা হবে। আপনার জন্যে আমার হৃদয়ের অভ্যর্থনা সবসময়েই অবারিত, কিন্তু আসানসোলে বর্তমানে স্থান সঙ্কোচে কষ্ট পাচ্ছি। "অতিরিক্ত" হয়ে এসেছি বলে কোনো প্রশস্ত-প্রসন্ন বাসস্থান পাইনি।

মাঝে-মাঝে নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখবেন। আপনার চিঠিতে অন্যরকম একটা স্বাদ আছে। অন্যরকম স্পর্শ নিয়ে আসে আপনার চিঠি।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিন ইতি।

প্রীতিমুগ্ধ
অচিন্ত্য

এবারের পত্রটি কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের। বিভূতিভূষণ তাঁকে কালিদাস দাদা বলেই ডাকতেন। কালিদাসবাবুও তাঁর এই ভাইটির অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর কয়েকটি চিঠির

মধ্যে একটিই বেছে নিচ্ছি যার মধ্যে বিভূতিভূষণকে উদ্দেশ করে পোস্টকার্ডের ভিতরেই লেখার প্রশংসা করে কবিতা লিখে দিয়েছিলেন :

ভ্রাতৃবরেষু

দুরুদুরু ছোট বুক ছোট সুখ ছোট দুখ
তাই নিয়ে লিখিতেছ সারাটি জীবন।
বড় বড় দেশভরা ক্ষুধাশোক রোগ জরা
তার কথা লিখিতেছে কত শতজন।
একটুকু সোনা দিয়ে হাতুড়ি ও ছেনি নিয়ে
গড়িছ কানের দুল করি ঠুক ঠুক।
নিয়ে লোহা ইটকাঠ ইমারত ফিটফাট
গড়িছে কতই তারা তাহাই গড়ুক।
রাজমিস্ত্রীর কথা স্মরিয়া পেওনা ব্যথা
ইমারতে সভা হবে ঘন জনতার,
বাংলার ঘরে ঘরে বধূদের শ্রুতি পরে
শোভিবে তোমার ফুল তুমি মণিকার।

শ্রী কালিদাস রায়।

আরও একটি পত্র যার লেখক আতাওয়ার রহমান মহাশয়। তিনি ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ সালে *ত্রিকাল* নামে একটি পত্রিকা থেকে একটি গল্প চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। চিঠির বয়ান :

Trikal
an annual of the four arts Sept 6.43
123, Lower Circular Road, Calcutta

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি হয়'ত জানেন গত বৎসর আমরা 'ত্রিকাল' বলে একটা — বার্ষিকী বের-করেছিলাম — পাঠকদের কাছ থেকে খানিকটা সমাদরও পেয়েছিলাম — সেইজন্য এবারও অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে বের করতে মনস্থ করেছি। এতে আপনার একটা গল্প চাই। সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে যদি পাই তা হলেও আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের বিশ্বাস আমাদের এই প্রচেষ্টায় আপনার সাহায্য এবং সহানুভূতি পাব। গল্প পাওয়া মাত্রই আপনার পারিশ্রমিক পাঠিয়ে দেব। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন ইতি —

আতাওয়ার রহমান

এবারের পত্রটি স্বয়ং বিভূতিভূষণ লিখছেন তাঁর স্ত্রী রমা দেবী (কল্যাণী)কে। তাঁর নিজের প্যাডে লেখা, মির্জাপুর স্ট্রিট থেকে।

Bibhuti Bhushan Bandyopadhaya. 41 Mirzapur Street,
Calcutta ২৬ শে কার্ত্তিক'৪৭ সাল

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের কাছ থেকে এসে পর্য্যন্ত তোমার কথা সর্ব্বদা মনে পড়চে। মন মোটেই ভাল নয়। বারাকপুরে সেই পিক্‌নিক্ করার কথা বিশেষ করে সর্ব্বদা মনে পড়চে — তুমি কোমরে কাপড় জড়িয়ে রান্না করচো বনসিমতলায়, সেই তোমার চেহারাটা চোখে ভাসচে যেন। কি চমৎকার দিনটা কেটেছিল সেদিন বারাকপুরে! জ্যোৎস্না রাত্রে নৌকোয় বাইরে বসে আমাদের সেই নানারকমের গল্প, সেই বা কি মধুর। জীবনের এইসব স্মৃতি মনের ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকে, তোমার নতুন মনে তো আরও।

সত্যি, কল্যাণী — এত অল্পদিনের মধ্যে তোমার আমার মধ্যে এরকম বন্ধুত্ব কি করে গড়ে উঠলো, কত বার একথা ভেবেচি। এখন মনে হচ্চে সবই ভবিতব্য। তুমি যেদিন আমার বাসায় অটোগ্রাফ আনতে যাও, সেদিনটা থেকেই এ বন্ধুত্বের প্রথম অঙ্কুর সকলের অলক্ষ্যে প্রথম ফুটেছিল। এ কথা কতবার ভেবেচি আর আমার মনে এমন অদ্ভুত মনে হয়েচে সমস্ত ঘটনাটা! গল্পে উপন্যাসে এমন ঘটনা ঘটে, কিন্তু বাস্তব জীবনেও যে ঘটলো, তা আমার কাছেও সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

কানু[১] কাল সন্ধ্যাবেলা আমার বাসায় এসেছিল, অনেকক্ষণ ছিল, অনেক গল্প করে গেল। ও তোমার গল্প অনেকক্ষণ ধরে করলে, আমারও শুনতে কত ভাল যে লাগছিল! তোমার ওপর আমার কি স্নেহ পড়েচে, তা বলতে পারিনে। মনে হচ্চে আবার এখুনি ছুটে গিয়ে দেখা করি।

আমি তোমাদের সেই কানের পাথরগুলোর কথা কানুকে বলেচি। সে মায়ার কাছ থেকে নিয়ে এসে আমার কাছে রেখে যাবে। তোমার বাবা[২] এখানে আসেন তো তাঁর হাতেই দেবো, নয়তো নিজে নিয়ে যাবো, যদি সামনের শনিবারে যাওয়া ঘটে। আমার যাওয়ার তো খুবই ইচ্ছে, এখন ভয় হচ্চে ছোট মামা[৩] শনিবারে আমায় ডেকে না পাঠান, পরামর্শ ইত্যাদি করার জন্যে। তা হোলেই আর বনগাঁয়ে যাওয়া হবে না। আমার কি খারাপ যে লাগবে না যেতে পারলে!

এমন মুস্কিল, সকাল থেকে অনবরত লোক আসচে দলে দলে। চিঠি লিখবার সময় অতি কষ্টে করলুম, নয়তো আজ চিঠি দেওয়া হোত না। ভাবলুম, কল্যাণীকে কথা দিয়ে এসেচি চিঠি দিতেই হবে আজ, নইলে সে মনে কষ্ট পাবে। এখন প্রায় দশটা বাজে, খুব তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লিখতে হোল। লোকে এতটুকু সময় করতে দেয় না।

---

১. কল্যাণীদেবীর ছোটোমামা নীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, যাঁর প্রকাশনালয়ের নাম ছিল 'গ্রন্থালয়'।

২. কল্যাণীদেবীর পিতা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

৩. বিভূতিভূষণের ছোটোমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি ভাটপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

তোমার চিঠি যেন একখানা অন্ততঃ শনিবার সকালেও পাই। শুক্রবারে পেলে খুব খুশি হবো। ঠিক দেবে তো? দেওয়াই চাই।

কিন্তু চিঠিতে কি হয়? দেখতে ও কথা বলতে ইচ্ছে করে বেশী। চিঠিতে তা কতটুকু পূর্ণ হয় বলো। ছোট মামা যদি ব্যাঘাত না ঘটান, তবে শনিবারে নিশ্চয়ই যাবো। রাত্রের গাড়ীতে যদি যাই, ঘুমিয়ে পড়ো না যেন সেদিন কার মত — কেমন তো?

স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও — ও বেলু[৪] এবং অন্যান্য সবাইকে জানিও। বেলা হয়ে গেল বড্ড, এখুনি নাইতে না গেলে স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার শ্বশুরমহাশয়ের সঙ্গে শাশুড়িমায়ের পরিচয় হয় অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে। তাঁর জীবনের মর্মান্তিক শোকের সময় তখন। ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে আকস্মিক মৃত্যু হয় শ্বশুরমহাশয়ের বোন জাহ্নবীর। বোনের চিরতরে চলে যাওয়ার দু-দিন পরে বিভূতিভূষণের সঙ্গে পরিচয় হয় রমাদেবীর। দুই অসমবয়সি মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব একবছর কয়েকদিনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে গড়িয়ে যায়।

পরিচয় এবং বিয়ের আগে ও পরে বিভূতিভূষণ রমাদেবীকে বেশ কয়েকটি চিঠি লেখেন। বিয়ের কয়েকদিন আগে লেখা একটি চিঠি এবং বিয়ের কয়েকদিন পরে লেখা আর একটি চিঠি এখানে পরপর ছাপা হল। উল্লেখ্য, শাশুড়িমাকে লেখা শ্বশুরমহাশয়ের আগের চিঠিটিও এই সময়ের।

আমার শাশুড়িঠাকরুন অর্ধশতাব্দীর ও বেশি সময় শ্বশুরমহাশয়ের লেখা ও তাঁকে লেখা নানান ব্যক্তিত্বের চিঠিগুলো সযত্নে রাখার পর — আমাকে দিয়ে গিয়েছেন চিঠিগুলো যত্নে রাখার উত্তরাধিকার।

Bibhuti Bhushan Bandyopadhaya.

41 Mirzapur Street,
CALCUTTA রবিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার এবারকার পত্রখানা চমৎকার হয়েচে কল্যাণী। শেষের কবিতাটি কার — রবীন্দ্রনাথের? কোথায় যেন দেখেচি, অথচ ঠিক মনে করতে পারচি নে! কানু শনিবার না শুক্রবারে এখানে এসেছিল, সে বোধ হয় রবিবার বনগাঁ যাবে। তার কাছে কয়েকটা দরকারী কথা বলে দিয়েচি। আমার অত্যন্ত ভয় হচ্চে যত বিয়ে এগিয়ে আসচে। আমি রইলুম কলকাতায় বসে, নুটু বসে রইল ঘাটশিলায়। কাজকর্ম্মের কিছুই ঠিক হল না এখনো। অনেক কিছু অনুষ্ঠান আছে বিয়ের, পিঁড়ি

৪. বেলু কল্যাণী দেবীর সেজো বোন।

৫. বিভূতি মুখোপাধ্যায় (বিভূতিভূষণের গ্রামের বন্ধু, যাঁকে তিনি 'মিতে' বলে ডাকতেন)

চিত্রকরা, শ্রী গড়া, ডালা সাজানো এসব কে করবে বুঝতে পারচি নে। কানুকে দিয়ে বলে দিয়েচি বিভূতি মুখুয্যেকে ৫ বলতে কাজকর্ম্মের একটা ব্যবস্থা ঠিক করা।

আমারও খুব আশ্চর্য্য মনে হয় তোমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত সব কথা ভাবলে। এখন মনে হচ্চে হয়তো অনেক জন্মের বন্ধন ছিল তোমার সঙ্গে — নয় তো এমন হবে কেন? কল্যাণী, তুমি আমার অনেক দিনের পরিচিতা, এবার এত দেরিতে দেখা হোল কেন জানি নে, আরো কিছু কাল আগে দেখা হোলে ভাল হোত। যাক্, তার আর কি করা যাবে — ভবিতব্য সেই মুহূর্ত্তে (মুহূর্তে) আসবে, যে মুহূর্ত্তে (মুহূর্তে) তার সময় হবে। আমি এটা বিশ্বাস করি যে মানুষের আয়ু দ্বারা মানুষের সত্যিকার বৃহত্তর জীবন মাপা যায় না — এ একটা বিরাট বৃত্ত, হাজার হাজার বছর এর পরিধি। তুমি নেই, আমি নেই। আছে তোমার আত্মা, আমার আত্মা — লক্ষ বছর তাদের স্থিতি কাল। সে বিরাট vision দিয়ে জীবনকে যে দেখেচে, জীবনকে সত্যিকার সেই চিনবে।

আমি তোমার সঙ্গে হৃদয়হীন ব্যবহার করবো কেন জীবনে? তা বুঝি কেউ করে? আমি তোমায় ভালবাসবো যেমন বাসি — স্নেহ করবো যেমন করি। এ থেকে এক তিল ভালবাসা কমবে না, বাড়বে বই কমবে না। তুমি ভালবেসে আমার ঘরে আসতে চাইচ, তোমার কত ভাল পাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পার তো — কিন্তু তা যখন তুমি ফেলে আসতে চাই চ — তখন তোমার ভালবাসার মান আমায় রাখতে হবে বইকি। তোমাকে ভালবাসি ও স্নেহ করি বলেই বিবাহে মত দিয়েছিলুম। নইলে কেউ কি আমায় আবার বন্ধনের মধ্যে ফেলতে পারতো?

আশীর্ব্বাদ করি তুমি ভালবেসে তৃপ্তি পাও। সুখী হও জীবনে। আমাকে তোমার ভক্তি করার লাগবে না (পূর্ববঙ্গের টান এসে পড়েচে ইতিমধ্যে দ্যাখো কাণ্ড!) ভালবেসো, তা হলেই আমার আনন্দ। শ্রদ্ধা, ভক্তি ওসব দেবতাদের প্রাপ্য, মানুষে কি পায়? মানুষের কত ত্রুটি, বিচ্যুতি, কত ভুলচুক — তারা কি ভক্তির পাত্র? আমার মধ্যে কত হীনতা দেখবে, কত কি খারাপ দেখবে, তখন কি ভক্তি হয়? তা হয় না। হ্যাঁ, তবে ভালবাসা অন্য জিনিস। যে যাকে ভালবাসে, তার শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও সে ভালবাসা কমে না বরং বাড়ে। ভালবাসাকে বড় বলেচে এইজন্যে — 'Love is God' মানুষের যে হৃদয়ে বন্ধুত্ব, ক্ষমা, করুণা ও স্নেহের সিংহাসন পাতা — ভগবানের সিংহাসনও সেখানে।

সুতরাং তুমি নিঃসন্দেহে থাকতে পারো, ভালবাসব চিরকালই তোমায়। তোমার ওপরে নিষ্ঠুর হতে বুঝি পারবো কোনোদিন? খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার জীবনে কারো সঙ্গে কোনোদিন করিনি, যতদূর আমার মনে হয়। তোমার মধ্যে যে গুণ আছে, সেগুলো ফুটিয়ে তোলা আমার একটা বড় কাজ হবে সবদিক থেকে। কল্যাণী, আমি জানি, তুমি ক্লিওপেটরা বা নূরজাহান নও, কিন্তু বাইরের রূপ ক'দিনের? অন্তরের যে রূপ চিরদিনের, তোমার মধ্যে আমি তা প্রত্যক্ষ যদি বা করতুম, তবে আমি তোমার সঙ্গে অত মিশতাম?

নুটুকে চিঠি লিখে দিয়েচি, সে বৃহস্পতিবার সম্ভবত বনগাঁয়ে গিয়ে পৌঁছুবে। আমি যাবো রবি বা সোমবার। তুমি সুরেনকে বলেছিলে বারাকপুরে পুরোহিত ঠিক করার কথা? সে কি গিয়েছিল?

আমার প্রীতি ও ভালবাসা নিও।

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
('শ্রী' ছাড়া লিখি না, তুমি সেই বলেছিলে তারপর থেকে
কোথাও না — ভাবি কল্যাণীর অনুরোধ, না রেখে পারি?)

পুঃ তুমি ৪/৫টা গান ভাল করে তৈরি রেখো। কথা ও সুর সুদ্ধ। মামার বাড়িতে বা অন্যত্র তোমার গান শুনতে চাইবে। হারমোনিয়ামের সঙ্গে সেটা করে রাখতে যদি পারো তো ভাল হয়। কারো উপর নির্ভর না করে যাতে গাইতো পারো, এজন্যে কথাগুলো জানা দরকার। এটি বিশেষ দরকার — মনে থাকবে?

Bibhuti Bhushan Bandyopadhaya

41 Mirzapur Street,
CALCUTTA বুধবার, ১১।১২।৪০

প্রিয়তমাসু,

উঃ কল্যাণী দেখে কি হাসিই হাসবে! 'কল্যাণীয়াসু' পাঠ চলে গেল কি করে এ ক'দিনের মধ্যে — হয়ে পড়লুম 'প্রিয়তমাসু'! কিন্তু তাই তো হয়ে উঠেচ কল্যাণী, লক্ষ্মীটি — তোমার কথা সবসময়েই মনে পড়চে যে এই ক'দিনে। মন থেকে এক দণ্ডও তুমি কোথাও তো যাও না। বলরাম সরকারের ঘাটে সেই তুমি আর আমি যখন বসে ছিলুম সেদিন, সে কথা মনে পড়চে। ট্রেনে যখন আসছিলুম সে কথা মনে পড়েচে — তোমার অলস স্বপ্নমদির চোখ দুটির ভাবময় দৃষ্টি, শেষ রাত্রের উষ্ণ শয্যায় বাহুবন্ধনের আকুল বন্ধুত্ব, ঐসব আমার মন থেকে মুছে যাবে না কোনোদিন। তাই তোমার কথা সব সময়েই মনে পড়চে, কেন আগেও তো মনে পড়তো — এখন সেই চিন্তাই যেন আরও স্নেহময় ও প্রগাঢ় হয়ে উঠেচে, কেন কি করে বলি?

সত্যি, তুমি আর আমাকে 'আপনি' বলে ডেকো না, সব মেয়েই তো 'আপনি' বলে — খুকু, সুপ্রভা, মিনু — সবাই। আমায় 'তুমি' বলে ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করবে কেউ, এ সাধ আমার কত দিন থেকে ছিল — দয়া করে আমার জীবনে লক্ষ্মীর মত এলেই যদি, তবে আমার সেই অনেক দিনের সাধ পুরতে দাও, লক্ষ্মীটি। এখন থেকে তোমার মনের সব কষ্ট বুঝবার দায়িত্ব আমার। তোমাকে সুখী করবার ভার এখন আমার — আমি সে ভার সানন্দে ও স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্চি। অবিশ্যি যতদূর আমার সাধ্যিতে কুলোয়।

অতএব তুমিও আমার মনের সাধগুলো পূর্ণ করবার চেষ্টা করবে না কি লক্ষ্মী? 'আপনি' বল্লে আমার যেন কোথায় লাগে। ঠিক বোঝাতে পারিনে। আমারও স্বভাব, কখনো অভিযোগ করিনে, কারো বিরুদ্ধে নয়, নিজের সুখের জন্যেও নয় — কিন্তু কখন করি জানো যখন চোখের সামনে কোনো অন্যায় কি অবিচার দেখি, কিংবা কেউ খারাপ হয়ে যাচ্চে পড়াশুনো না করে কিংবা কুসঙ্গে মিশে — এমনতর দেখি।

তোমার জন্যে মন সর্ব্বদাই উড়ু উড়ু করচে! হয়তো শেষপর্য্যন্ত শনিবারেই যেতুম, কিন্তু সিটি কলেজ ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে হবে ওদিন, অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরী কাল এসে বলে গিয়েচে।

তোমার গল্প যে কত জায়গায় আমায় করতে হচ্চে! শোনো, সেদিন অর্থাৎ আমাদের বিয়ের দিন কি হয়েছিল জানো? মণি বোস ও তার স্ত্রী সবিতা মোটরে বেরিয়েছিল বনগাঁয়ে যাবে বলে বেলা ৫টার সময়, দত্তপুকুরের এধারে কি একটা গ্রামে যশোর রোডের ওপর ওদের মোটর বিগড়ে যায়। বেচারীরা ঘণ্টা দুই সেখান থেকে তারপর একখানা লরি ডাকিয়ে তাতে কলকাতা ফেরে, ড্রাইভারকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে। এখানে এসে এ গল্প শুনলুম। ওরা ভারি দুঃখিত হয়েচে না যেতে পেরে। সবিতার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল আমার বিবাহ সভার উৎসবে যোগ দেবার।

তোমার লেখা গল্প পাঠিও যত তাড়াতাড়ি পারো। 'তরুণতরুণী'র সম্পাদক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তোমার লেখা চেয়ে গিয়েচে। মাঘ মাসেই যাতে বার হয় সে জন্যে বলেও গিয়েচে।

তাই তো কল্যাণী, তুমি শেষকালে আমার স্ত্রী হয়ে পড়লে? আমার যে স্ত্রী আছে — এখনও যেন সে কথা আমার মনে হয় না, যেন বিশ্বাস হয় না। এত আপনার হয়ে উঠলে তুমি, এ কি সত্যি? 'স্বপ্নো নু, মায়া নু' কীট্‌সের ভাষায় 'Is it a vision or a waking dream?' মনে মনে কতদিন থেকে তোমার মতই মেয়ে চেয়েছিলুম — স্নেহময়ী, ভাবোচ্ছ্বাসময়ী, সেবাপরায়ণা, সুরসাধিকা — (সুর এখানে শুধু সঙ্গীতের সুর নয়, যে কোনো কলা, যে কোনো সৃষ্টির একটা নিজস্ব সুর বর্ত্তমান, সাধনা দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে হয়, সুরলক্ষ্মী বড় অভিমানিনী নায়িকা, কত সাধ্যসাধনা করে যে তাঁকে বশ করতে হয়!) — হয়তো বা বহুদূর অতীতের কোনো জীবনে মন্থর অলস দিনগুলিতে, অজ্ঞাত পথতলে, ভুলে-যাওয়া গ্রামসীমার বেষ্টনীর মধ্যে তুমি ছিলে আমার সঙ্গিনী, কি জানি কি রঙের কাপড় পরতে, কত কি ছলাকলায় মন আমায় ভুলিয়ে ছিল সেবারও, কি জানি কত যুগ ধরে এমনি করে আসবে, আরও কতযুগ ধরে চলবে।

আমি একটা কবিতা লিখচি তোমায় নিয়ে, হয়তো কাগজেও দেবো, তবে তার আগে তোমায় দেখিয়ে নেবো — বড় দিনের ছুটিতে। কারো নাম নেই কবিতায়, সম্পূর্ণ abstruct ধরনের কবিতা, অথচ যে বুঝবে সে ঠিকই বুঝবে।

চিঠির উত্তর দিও খুব তাড়াতাড়ি।

বারাকপুরে যাবো কিন্তু বড় দিনের ছুটিতে। ৭/৮ দিন শান্ত পল্লীজীবন যাপন করতে আমার মনে হয় তোমার খারাপ লাগবে না। গল্প লেখার দিক থেকেও নতুন উপকরণ পেতে পারবে।

আজ আসি। ঘণ্টা বেজে গেল। প্রাইজের জন্যে ছেলেদের আবৃত্তি শেখাতে হচ্চে স্কুলে। টেষ্ট্ পরীক্ষার এক গাদা খাতা জমে আছে তার ওপর।

প্রীতি ও ভালবাসা নিও। বেলু ও খোকাখুকীদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। মা ও শ্বশুর মশায়কে আমার সভক্তি প্রণাম জানিও।

আশা করি সব কুশল। তোমার ব্লাউজ আজ করতে দিয়েচি দোকানে।

ইতি

তোমারই প্রীতিবদ্ধ

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার শ্বশুরমশাইয়ের কথা যদি বলে যাই, তাহলে লেখা শেষই হবে না। প্রত্যেক পত্রিকারই একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। আমার শ্বশুরমশাইয়ের একটি দিনলিপি থেকে কিছু উদ্ধৃতি লিখে আমার লেখার সমাপ্তি ঘটাবো। দিনলিপির নাম *তৃণাঙ্কুর*।

কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হলো। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু[৬] উপস্থিত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগ করলেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল করেন, দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে।

আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশি।

... শুধুই মনে হচ্ছিল জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখতে শিখিনে বলেই যত গোল বাধে। জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্র হবে। জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।

...

... আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপা হোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি — কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী অফিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক দু মাস লাগলো ছাপতে।

ঘন বর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে-সব কথা এখানে আর তুলবো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে বসে বনাতমোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা — সেই কার্তিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়িটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তা-শ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে-সব ছবি — সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ'মাস কি খাটুনিটাই গিয়েচে! জীবনে কখনও বোধহয় আমি এরকম পরিশ্রম করিনি — কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত কাটিয়েচি।

---

৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভাষাবিদ্) ও বিভূতিভূষণের পরমবন্ধু।

মাথা ঘুরে উঠেচে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে কেয়াঝোপে বসে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লালফুল-ফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বই-এর শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকুটি ...
যাক্, বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি; তা যে দিইনি, তিনি অন্তত সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কি না জানি না, আমার কাজ আমি করেচি; (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরনো কলমটা দিয়ে, — যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষদিকটাতে পার্কার ফাউন্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান্ নই — বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।